যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

বড় বিচিত্র শহর এই কলকাতা। শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে প্রতিদিন প্রতিনিয়তই ব্যস্ততা আর ছুটে চলা...একে অপরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতাটা এখানে অনেক বেশি। প্রতিযোগিতা গাড়িদের মধ্যেও। যতই শিওরিটি বাড়ছে ওলা-উবের-ট্যাক্সির, ঠিক ততটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে কলকাতার ইকো-ফ্রেন্ডলি যান টানা রিকশার ভবিষ্যৎ। তাই গরমের দাবদাহে রাস্তার পাশে ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে পুরনো কলকাতার পুরনো যান।

ফোটো: **সায়ন হাজারি** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

রতনতনু ঘাটী (কবি)

এ কলকাতাকে এখন আমার নিজের শহর বলেই মনে হয়। বেশিদিন একটানা এ-শহরকে ছেড়ে থাকতে পারি না। মন-কেমন করে। তার অনেকটাই বাংলা ভাষার জন্যে। আর নাটক-সংগীত, সিনেমা, ছবি ও সাহিত্য নিয়ে এমন ভালোবাসা আর পাগলামি এ-দেশের অন্য কোন শহরে খুঁজে পাব? তাই এ-শহর বড় মায়াময়।

আমি মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে যখন কলকাতায় এমএ পড়তে আসি, তখন এ-শহরটাকে বড্ড পর পর মনে হতো। মনে হতো দয়ামায়াহীন একটা কংক্রিটের শহর। কলকাতার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট ছিল অচেনাই। পায়ে হেঁটে কলকাতা চিনেছিলাম। তখনও কিন্তু মানুষজন ছিল বড় অচেনা আর কেমন কেমন। রাস্তা খুঁজতে গেলে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিত। মুখে বলত না যে, সে জানে না। এখনও পথ হারানো পথিককে এ শহরে কম হয়রান হতে হয় না। পথ হারানো বিদেশি পর্যটকের অসহায়তার কথা তোলাই থাক। আর কলকাতার আতিথেয়তা? সে আগের মতো এখনও বড় কৃপণ। কোনও বাড়িতে কারও খোঁজ করতে গেলে, তিনি বাড়ি না থাকলে, একটুখানি দরজা ফাঁক করে বাড়ির লোক বলে দেন, 'উনি তো বাড়ি নেই।' বসতে বলার মতো সৌজন্যবোধ অনেকটাই দুর্লভ। এ-শহরের চিকিৎসকদের অনেককেই এখনও এক-একসময় হন্তারক এবং অমানবিক বলে মনে হয়। বাঁ-পায়ের অসুখে ডান-পা কেটে বাদ দেওয়ার উদাহরণও খুব দুর্লভ নয়। চিকিৎসায় মানবিকতা ফেরাতে তা না হলে এ-রাজ্যের সরকারকে আইন করতে হয়? আর গোটা রাজ্যবাসীকে তল্পিতল্পা বেঁধে ছুটতে হয় দক্ষিণের রাজ্যে, একটুখানি সুচিকিৎসার আশায়।

এখন এ-শহর অনেকটাই সুশ্রী হয়ে উঠেছে ঠিকই। শহরের ফুসফুসে অক্সিজেন ভরে দিতে হলে আরও অনেক গাছ লাগাতে হবে। অন্য রাজ্যের শহরকে দেখে কলকাতা শেখে না কেন? রাস্তাঘাটের কর্কট অসুখ সেরে উঠেছে ঠিকই। কিন্তু পরিবহনের চেহারা আগের মতোই তেমনই হতদরিদ্র, আর ট্রাফিক তেমনই নির্লজ্জ। এ-শহরের অটোর এমন অমানবিক দৌরাত্ম্য আর কবে প্রশমিত হবে?

এরপর তিনের পাতায়

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

আগামীর পৃথিবীর বিভীষিকা রূপ

নীল সরকার

আমরা যারা শহরতলির লোক, তাদের চাকরির প্রয়োজনে রোজই ট্রেন-বাসের যুদ্ধ সামলে অফিস যেতে হয়, ফিরতে হয়। প্রথম প্রথম এই লাইফস্টাইলটা একটু আনইজি লাগলেও একসাথে যেতে যেতে তৈরি হওয়া বন্ধু, চেনা-পরিচিতিদের সাথে চলন্ত ট্রেনের ওই আটান্ন মিনিট যেন মনে হয় একটা পরিবারের রোজকার অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি। তবু এই যাতায়াতের পথে অনেক ঘটনা, অনেক দৃশ্য থাকে যা হয়তো আপাত সাধারণ, তবু কেন যেন মনকে নাড়িয়ে দেয়।

গরমের তীব্রতা এত বাড়ছে যে অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে দু'চারবার স্নান হয়ে যাচ্ছে রোজই। সান্যালদা ব্যারাকপুর থেকে ওঠেন আমাদের কম্পার্টমেন্টেই। সাউথের একটা স্কুলে পড়ান। সান্যালদাকে কম্পার্টমেন্টের সবাই একটু সমীহ করে, টিচার মানুষ তারপর সবসময় একটু হাসিখুশি মুডেই থাকেন। ট্রেনের আলোচনার বিষয়বস্তু তো প্রচণ্ড জোরে পাক খায় মানে এক টপিক থেকে আরেকটাতে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। কথায় কথায় এল গরমের প্রসঙ্গ। নানাজনের নানা বক্তব্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গাছ কাটা, প্রচুর পলিউশন— যে যার মতো বিদ্যে ফলাচ্ছে। সান্যালদাকে চিরকালই দেখেছি ভালো শ্রোতা। সান্যালদা হঠাৎই বলতে শুরু করলেন। এমনটা সচরাচর হয় না। বলছেন তাঁর ধারণা কেন এত গরম পড়ছে, আগামীর পৃথিবী নিয়ে বিজ্ঞানীদের কী আশঙ্কা, জলের লেয়ার নেমে যাচ্ছে কেন আরও কত কী। হঠাৎ শিয়ালদহ ঢুকতেই সবাই সেদিনকার মতো হুড়মুড় করে নেমে ছুটলাম।

ওই আলোচনার সময় জীবন নিয়ে, পরিবেশ নিয়ে আশঙ্কা যে তৈরি হয়নি তা বলব না। তবে আবার ছুটে চলার চাপে সব ভুলে ছুটলাম ডালহৌসি যাবার বাস ধরতে। অফিসেও পৌঁছে গেলাম সময়মতো। দুপুরের লাঞ্চ ব্রেকে বাইরে বেরিয়েছি। এসি থেকে বেরোতেই মনে হচ্ছিল একটা

আগুনের হলকা আমার দিকে ছুটে এল। এত গরম! এদিক-ওদিক একটু ঘোরাঘুরি করছি। অফিসের দু'জন কলিগ মিলে একটু এগিয়ে গেলাম ময়দানের দিকে। হাতে তো কিছুক্ষণ সময় আছেই। যেতে যেতে বুঝতে পারছিলাম সূর্যের এই প্রলয়তাণ্ডবের হাত থেকে বাঁচাতে এই ছাতাই যথেষ্ট নয়। যাইহোক তবু গল্প করতে করতে এগোচ্ছি।

অনেক কথাই আমরা শুনি, আবার ভুলেও যাই। অনেক আশঙ্কা ব্যস্ততায় ঢাকা পড়ে যায়। একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার পা আর সামনের দিকে এগলো না। আমার মনে হল আমি না যেন গোটা পৃথিবীই ক্ষণিকের জন্য থমকে গেছে। একটা বস্ত্রহীন পাগল মিউনিসিপালিটির লাগানো একটা মরা চারাগাছে একবার জল ঢালছে একবার নিজের গায়ে জল ঢালছে। সান্যালদার মুখটা মনে পড়তে লাগল। চোখের সামনে ভাসছিল আগামীর পৃথিবীর বিভীষিকাময় রূপ।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

মুখরোচক যাদবপুর

সৈকত ঘোষ

কানে হেডফোন গুঁজে 'সামার অব সিক্সটি-নাইন' শুনতে শুনতে টাইমমেশিনে থুড়ি কলকাতার বাসে চেপে পৌঁছে গেছি আজকের ডেস্টিনেশন যাদবপুর ৮বি তে। তাপমাত্রার পারদ ৩৯ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই।

সিনে যখন যাদবপুর চলেই এসেছে তখন হোক কলরবের জতুগৃহকে কী করে ইগনোর করা যায়। ঠিকই ধরেছেন শুরুটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস থেকেই করব। আচ্ছা জীবনে অনেক রকম চপই তো খেয়েছেন কিন্তু ঢপের চপ! গালে হাত দিয়ে ভাবছেন সেটা আবার কী বস্তু ঘোড়ার ডিমের মতো কেস নয় তো? না এ চপ যে ঢপের নয় সেটা একবার খেলে আপনিও এক বাক্যে স্বীকার করবেন। আপাতত আমি মিলনদার ক্যান্টিনের ঢপের চপের ফ্যান হয়ে গেলাম। এবার আপনাদের পালা।

গুটি গুটি পায়ে পরের ডেস্টিনেশন সুজিতদার ক্যান্টিন। বেশ কয়েক মিটার দূর থেকেই একটা অতিলৌকিক গন্ধ আপনাকে টেনে আনবে। এখানকার আলুর পরোটা উইথ চিকেন হাড্ডি কাবাব নির্দ্বিধায় বলছি আপনিও দশে দশ না দিয়ে পারবেন না। আপাতত যাদবপুর ক্যাম্পাসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে আজকের মতো রওনা দিলাম পরবর্তী গন্তব্যে।

এবার যেখানে ঢুকব তার নাম বেকড ক্লাব। ৮বি চত্বরের বেশ পরিচিত দোকান আর আপনি যদি খাদ্যরসিক হন তাহলে এখানকার চিকেন ইতালিয়ানো আপনার জন্য ওয়েট করে আছে। একবার খেলে হলফ করে বলতে পারি আপনিও মোহিত হয়ে যাবেন। শুধুমাত্র ইতালিয়ানোর বাহানায় মাঝে মাঝে যাদবপুরে ঢুঁ মারবেন এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এ পর্যন্ত এসেই খিদেটা আরও চাগাড় দিয়ে উঠলে আমার কাছে একটা দারুণ সলিউশন আছে না আমি রাজেশ খান্নার 'বাবুর্চি' মুভি দেখার কথা বলছি না বরং উইদাউট এনি হেজিটেশন সোজা হাজির হচ্ছি যাদবপুর বাবুর্চিতে। এখানকার মিক্সড ফ্রায়েড রাইস সঙ্গে চিকেন তন্দুরি— এক কথায় লা জবাব। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে পেটপুজোর জবরদস্ত ঠিকানা। তবে ওভারডোজ হয়ে গেলে বাইরে বেরিয়ে এসে মশলা সোডা ট্রাই করতে পারেন। একেবারে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল।

এতক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। সুয্যিমামা আজকের মতো রেস্ট মোডে। তাই সারাদিনের ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পর এবার চাই একটু জমাটি আড্ডা। আর আড্ডার কথা উঠতেই আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন যাদবপুর কফি হাউস। এক কাপ ব্ল্যাক কফি সঙ্গে বটার টোস্ট নিয়ে তক্কো-গল্পে দিব্যি কেটে যেতে পারে একটা জমাটি বিকেল। এখানকার বাতাসেই একটা ইনবিল্ড গল্পের আমেজ আছে। তবে সন্ধের যাদবপুর ইনকমপ্লিট থেকে যাবে ক্যাফে কবিরাকে ছাড়া। এ এক অদ্ভুত ক্যাফে, ঢুকতেই লাল নীল আলো রহস্যময়তার সৃষ্টি করে আপনাকে স্বাগত জানাবে। বই টি-শার্ট গানবাজনা খাওয়া-দাওয়া সব মিলে আপনাকে চমকে দেওয়ার জন্য রেডি একটা জমজমাট সন্ধে। যে কোনও একটা পছন্দের বই নিয়ে বসে যেতেই পারেন সঙ্গে পাইপিং হট দার্জিলিং চা এবং এখানকার ফেমাস কুকিজ। নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই ছক ভাঙা অ্যাম্বিয়েন্স আপনাকে মুগ্ধ করবে। জীবনটাকে একটু অন্যভাবে এক্সপ্লোর করতে চাইলে আপনার জন্য বেস্ট রিল্যাক্সিং প্লেস ক্যালকাটা ব্রিস্ট্রো। এখানকার ক্রিসপি চিকেন, চকোলেট সানডে দিল খুশ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তবে শেষ পাতে ১০০% বাঙালিয়ানা চাইলে একবার ঢুঁ মারতে পারেন ভূতের রাজা দিলো বরে। আর টি-টোয়েন্টি জমানায় শেষ বলে ছয় মারবেন যদি ভেবে থাকেন তাহলে হিন্দুস্তান সুইটস-এর লর্ড চমচম বেস্ট অপশন। একেবারে ১৬ আনার জায়গায় ১৮ আনা।

স্থিতিশীলতার বিপক্ষে বুদ্ধদেব বসু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

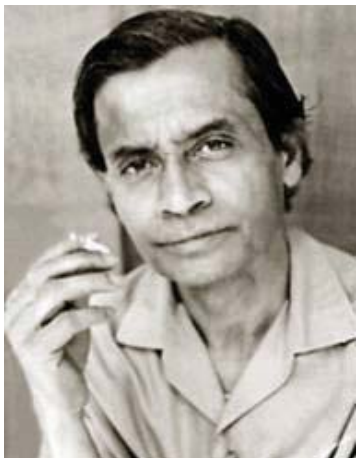

জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তাঁর মা বিনয়কুমারীর ধনুষ্টঙ্কার রোগে অকালমৃত্যু, শোকাভিভূত পিতা ভূদেব বসুর গৃহত্যাগ, এইসব ঘটনাগুলি শিশুটিকে অনাথ হতে দেয়নি তাঁর দাদু-দিদিমার অমলিন স্নেহচ্ছায়ার কারণে। তাঁদের কাছেই প্রতিপালিত হতে হতে তাঁর জন্ম থেকে (৩০ নভেম্বর ১৯০৮) শৈশব কাটে কুমিল্লায়। তারপর কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কাটে নোয়াখালি আর ঢাকায়। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' নামে দুটি পত্রিকায় লেখালিখির সুবাদে নিজেকে গতানুগতিকতার বাইরে বলে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে থাকার দুঃসাহস করেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেব বসু।

ঢাকা থেকে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাশ করে কলকাতায় এসেই তাঁর কর্মজীবন শুরু। যদিও শুরুতেই স্থানীয় কলেজের লেকচারারের পদের জন্য আবেদন করেও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। তিনিই আবার পরিণত বয়সে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অসাধারণ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। কলকাতায় রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা, স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা, পরে দিল্লি ও মহীশূরে ইউনেস্কোর প্রকল্প উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব নেওয়া, আমেরিকায় শিক্ষকতা করা, এসব পরপর চলতে থাকে। ১৯৫৬ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। যদিও ১৯৬৩-তে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে বিয়ে করেন প্রতিভা সোমকে, ১৯৩৪ সালে। যিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসু।

কলকাতায় এলে প্রিয় বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দুটো টিউশনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তখনও চাকরি না-পাওয়ায় বিয়ের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি করেননি। তারপর যেদিন প্রতিভা দেবীকে বুদ্ধদেব একটি এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনই খুব আশ্চর্যভাবে রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজটি তাঁর কাছে টেলিগ্রাম আকারে এসেছিল। বলেছেন প্রতিভা বসুই তাঁর 'জীবনের জলছবি' গ্রন্থটিতে।

বাংলা কবিতায় আধুনিক চিন্তা-চেতনা প্রবর্তনে তাঁর অবদান অপরিসীম। ছকভাঙা পথে পা বাড়ানোতেই তাঁর আনন্দ। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের যে অধ্যায়কে বলা হয় 'কল্লোল যুগ' সেই অধ্যায়ের তরুণতম প্রতিনিধি এবং অন্যতম প্রধান কান্ডারি ছিলেন তিনি। নিজেকে ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে তিনি এক অন্য কবিসত্তায় পৌঁছে যান। হৃদয়বাদী বুদ্ধদেব ক্রমশ হয়ে ওঠেন মননশীল কবি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিচিত্রমুখী স্রষ্টা। উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি অনন্য। ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকাটি তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পঁচিশ বছরেরও বেশি, তিনি পত্রিকাটির ১০৪টি সংখ্যা সম্পাদনা করেন এবং তাঁরই হাত ধরে আধুনিক বাংলা কবিতা তার যথার্থ আধুনিক রূপ লাভ করে। এটি কবি বুদ্ধদেব বসুর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি তাঁর বাড়ির নাম রেখেছিলেন 'কবিতাভবন', যা হয়ে উঠেছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তীর্থস্থান। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রায় সবারই লেখা 'কবিতা' পত্রিকা বা 'কবিতাভবন' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', সমর সেনের বেশ কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

সব বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫৬টি। তাঁর উপন্যাস 'রাতভর বৃষ্টি', 'তিথিডোর' ইত্যাদি তো সর্বজনবিদিত। কবি নরেশ গুহ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন, দিব্যেন্দু পালিত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো সৃষ্টিশীল খ্যাতিমান ছাত্রছাত্রীর প্রিয় মাস্টারমশায় বুদ্ধদেব আপাত রবীন্দ্রবিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন। সেই তিনিই বিয়ের কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো এসেছেন শুনে স্ত্রীকে নিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'মেয়েটিকে তো আমি চিনি গো। তাহলে এই গাইয়ে কন্যাটিকেই তুমি বিবাহ করেছ?' বাড়ি ফিরে বুদ্ধদেব স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তার আগেও দেখা হয়েছে সে কথা এতদিন সে বলেনি কেন। প্রতিভা বসু বলেছিলেন, 'প্রসঙ্গ ওঠেনি, জিজ্ঞাসাও করোনি, তাই বলা হয়নি।' বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'এর জন্য প্রসঙ্গ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন ওঠে? রবীন্দ্রনাথকে দেখা শোনা পরিচয় থাকা সবই তো একটা ঘটনা, একটা বলবার বিষয়।'

এত খ্যাতি তবু কেমন যেন একজন একা মানুষ। জন্মের পরই মাতৃহীন, বাবা দূরের মানুষ, দাদু-দিদিমার কাছে বড় হতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে স্থিতিশীলতা তাঁর ধাতে ছিল না। তাই শিকড়ের টান বা কোথাও থিতু হওয়ার আবেদনে তিনি আমল দেননি। সেটা সাহিত্যেও, জীবনেও। বাড়ি পালটেছেন অনেকবার। তাঁর সারল্যই তাঁর চরিত্রের আসল আকর্ষণ। তাঁর শত্রুসংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভালোবেসেছিলেন তাঁদের ভালোবাসাও ছিল অপরিমেয়। সেই ভালোবাসা নিয়েই তিনি ১৯৭৪-এ ১৮ মার্চ পাড়ি দেন আর এক অমর্ত্যলোকে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

মেমসাহেবের স্কুল

বীথি চট্টোপাধ্যায় (লেখিকা)

শ্বশুরবাড়িতে ছাদে ওঠার অনুমতি নেই স্বর্ণমণির। বাইরে কোনও কুটুম্ব-পরিজনের বাড়ি যেতে হলে গলা অবধি ঘোমটা দিয়ে পর্দা ঢাকা গাড়ি করে যাওয়া-আসা। দূরে একটি গ্রামে মাটির বাড়িতে থাকত সে। এখন কলকাতা শহরকে শ্বশুরবাড়ির জানালা দিয়ে দেখেই সে অবাক হয়ে রয়েছে। কত বড় বড় বাঁধানো রাস্তা, রাস্তার দুপাশে কী সুন্দর আলো। এগুলোকে নাকি গ্যাসবাতি বলে। কত বড় বড় বাড়ি। কী বড় বড় ঘর। ঘরের সঙ্গে পাকা শৌচ। বড় চৌবাচ্চা। শ্বশুরবাড়ি এসে থেকে সে রোজ খুব যত্ন নিয়ে স্নান করে। স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় স্বর্ণমণির। সকালে হাতে আতর মেখে তিনি বেরিয়ে যান অনেক রাতে হাতে জুঁই ফুলের গোড়ের মালা জড়িয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরেন। তবে যখন স্বর্ণমণির কাছে থাকেন তখন মানুষটি তাকে ভালোইবাসেন। স্ত্রীকে দামি দামি আতর, বিলিতি পারফিউম কিনে দেন গুণেন্দ্রনারায়ণ। তিনি স্বর্ণমণিকে বারণ করেছেন এ-বাড়ির লোককে স্বর্ণমণি যেন ঘুণাক্ষরে না জানায় যে গুণেন্দ্র তাকে ভালোবেসে কী কী উপহার দিয়েছে। স্বর্ণ ভয় পেয়ে তাই তার স্বামীর দেওয়া বিলিতি গন্ধ মাখে না, শিশিটা বাপের বাড়ি থেকে আনা ট্রাঙ্কের নীচে লুকিয়ে রেখেছে। শ্বশুরবাড়িকে খুব ভয় পায় স্বর্ণমণি। এরা যদি রেগে গিয়ে কখনও তাকে দূর করে দেয়, তার কী হবে? সে খুব ভালো আছে তার শ্বশুরবাড়িতে। তাকে এ-বাড়ির লোক কুন্তলীন তেল কিনে দেয়। কত সুন্দর সুন্দর শাড়ি তার। ছেলেরা বেরিয়ে গেলে রোজ বাড়ি ঢোকে এক কাপড়ওয়ালি। ছেলেরা কেউ তার কথা জানেই না। রং-বেরঙের জরিপাড় তাঁত, ঢাকাই, মসলিন সে নিয়ে আসে। স্বর্ণমণিরও ভাগ্যে জোটে দু- একটা। শাড়ি ছাড়াও সে আনে সুন্দরী হবার নানা রকম জড়িবুটি, মোটা হবার ওষুধ, রোগা হবার ওষুধ— এমন কত কী। এমনকী স্বামী যদি ভালো না বাসে তারও ওষুধ আছে ক্ষমা বলে এই কাপড়ওয়ালির কাছে। সে ওষুধ অবশ্যি দরকার পড়ে না স্বর্ণমণির। তবে রং ফরসা করবার ওষুধে তার খুব ঝোঁক। শাশুড়ির সামনে ভয়ে সে মুখ ফুটে বলতে পারে না যদিও। কিন্তু তার বড় সাধ যে সে টকটকে ফরসা হবে। তার রং আর পাঁচটা বাঙালি মেয়েরই মতো কিন্তু এ-বাড়ির গোলাপদিদির গায়ে যেমন সাদা ময়দার মতো রং তেমন হতে খুব ইচ্ছে করে স্বর্ণমণির। তবে যতই সুন্দর আর ফরসা হোক, গোলাপদিদি তো তাদের মতো চুল রেখে, রঙিন শাড়ি পরে সাজতে পারবে না। গোলাপদিদি এ-বাড়ির মেয়ে। বিধবা হবার পর শ্বশুরবাড়ির লোক কাশী পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল ওকে। স্বর্ণমণির শাশুড়ি কান্নাকাটি করে শ্বশুরের হাতে-পায়ে ধরে নিজের মেয়েকে বাড়িতে এনে তুলেছেন। এসব স্বর্ণমণি শুনেছে তার জায়েদের মুখে। তার বড় জা লক্ষ্মীরানি তো প্রায়ই বলে গোলাপদিদির জন্যে বাড়িতে অকল্যাণ হবে। বিধবা কখনও গেরস্ত বাড়িতে পুষতে নেই। মুখ দেখলে অমঙ্গল। অপয়া। বিধবারা সত্যি অপয়া কিনা স্বর্ণমণি জানে না তবে তার ভয় করে যদি সত্যি গোলাপদির জন্যে তার স্বামীর কোনও ক্ষতি হয়। মা-ঠাকুমার মতো চোদ্দো বছরের স্বর্ণমণি নিজের হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকায়। রক্ষা করো ঠাকুর। নিজের কোনও ক্ষতি হবে ভাবলেও কেঁপে ওঠে স্বর্ণমণি। সে ভালো আছে। মাথার তেল, সোনার গয়না, নতুন শাড়ি, পেট ভরে খাওয়া ছাড়া আর কী চাই তার? জানালার ধারে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বাইরে রাস্তা দেখলেও কেউ আপত্তি করে না এ-বাড়িতে। একদিন রবিবারে ভালোমন্দ রান্না হয়েছে। ছেলেদের খাইয়ে-দাইয়ে মেয়েদের খেতে খেতে অনেকবেলা হয়ে গিয়েছে। একখিলি পান মুখে দিয়ে জানালার সামনে সবে দাঁড়িয়েছে স্বর্ণমণি। তার স্বামী পালঙ্কের ওপর ঘুমোচ্ছে চিত হয়ে। নীচে সদর দরজায় কে কড়া নাড়ল। এসময় কে এল? রবিবারে তো কোনও বাসনওয়ালি, কাপড়ওয়ালি এ-বাড়িতে আসে না। গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা নিচু করল স্বর্ণমণি। লম্বা সাদা জামা পরা একটা মেয়ে নীচে দাঁড়িয়ে। মাথার চুলগুলো লাল লাল। চুলগুলো আবার চুড়ো করে মাথার ওপর বেঁধেছে বোষ্টমীদের মতো। যতটা ঝুঁকে দেখা যায় স্বর্ণমণি দেখল। তার ইচ্ছে করল একছুটে নীচে গিয়ে ভালো করে ব্যাপারটা দেখতে। কিন্তু সে জানালা থেকে সরল না। দরজা খুলেছেন তার শ্বশুরমশাই ধর্মনারায়ণ। শ্বশুরের সামনে এখন দরজার গিয়ে দাঁড়ানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ধর্মনারায়ণ কথা বলছেন মেয়েটির সঙ্গে। কী কথা হচ্ছে তা চেষ্টা করেও শুনতে পেল না স্বর্ণমণি। একটু পরে বেশ জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন ধর্মনারায়ণ। স্বর্ণমণি দেখল মেয়েটা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। একবার ওপরে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। কী ফর্সা মেয়েটার মুখটা। মেম নাকি? সে তাদের গ্রামে দু'বার মেম দেখেছে। কিন্তু এই মেমটা তাদের থেকে বেশি সুন্দর। মেমটা কেন এল তাদের বাড়িতে? ধর্মনারায়ণ গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্বর্ণমণির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নিজের ছেলেকে ডাকলেন। গুনেন? অ্যাই গুনেন? চিত হয়ে মৌজ করে শুয়ে আছিস বাবা? গতর নাড়িয়ে দ্যাখ বাড়ির কী সর্বনাশ হচ্ছিল। গুনেন ধড়ফড় করে উঠে ধুতিটা কোনওরকমে কোমরে জড়িয়ে চেঁচাল। ডাকাত, ডাকাত। বাঁচাও। গুণেন্দ্রর সদ্য ঘুমভাঙা চোখে মুখে আতঙ্ক। বাড়ির অন্য মেয়ে-পুরুষ ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। শুরু হয়েছে প্রবল চেঁচামেচি। কিন্তু স্বর্ণমণি যাকে দেখেছে সে তো ডাকাত নয়। রোগা চেহারার এক মেম। তাহলে কী এমন হল! বিকেলে শ্বশুরমশাই তাঁর নীচের দালানে পাড়ার পুরুষদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন। মেয়েরা সেখানে অবশ্যই যাবে না। বৈঠকের কারণ আজকের এই মেম নারী। স্বর্ণমণি শুনল ওই সুন্দর মতন মেম মেয়েটা নাকি এ পাড়ার সব কটা বাড়িতে গিয়েছে। তার শাশুড়ি কমললতা ছি ছি করছিলেন। কমললতা কপালে করাঘাত করে বললেন, যে বাড়িতে সোমত্থ মেয়েমানুষ রয়েচে সেখানেই হানা দিচ্ছে ডাইনিটা। মেয়েগুলোকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে। অলক্ষুণে ইস্কুল করেছে একটা। মাগো রাক্ষুসি। লেখাপড়া শিখিয়ে পথে নামাবে ভদ্রবাড়ির বউ-ঝিদের। তার জা লক্ষ্মীরানি হাসে। রাঁড় বানাবে গো, রাস্তার রাঁড় বানাবে। বলি না হলে লেখাপড়া শিখে মেয়েমানুষ করবে কী শুনি। এই মেমটা কায়দা শেখাবে গো, কায়দা। লক্ষ্মীমণি হেসে ঢলে পড়ে, চিৎপুরের রাঁড়গুলো কত কায়দা শেখে নইলে কী এমনি এমনি ব্যাটাছেলেরা ওদের গয়না দেয়, থ্যাটার করার টাকা দেয়?

স্বর্ণমণি মেমটাকে একবার দেখেছে। কেন জানে না স্বর্ণমণির মেমটাকে নিয়ে লক্ষ্মীরানির নোংরা নোংরা কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে করল না। মেমটাকে দেখলেই ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে তা স্বর্ণমণি জানে না। তবে স্বর্ণমণি ভেবে পায় না মেমটা শুধু শুধু ভদ্র বাড়ির বউ-ঝিদের ইস্কুল খুলতে গেল কেন? সে গ্রামে তার দাদাদের পাঠশালায় যেতে দেখেছে, সে জানে লেখাপড়া শিখতে বড্ড কষ্ট। তার দাদাকে পড়া না পারলে বেত দিয়ে পেটাত গুরুমশাই। মেয়েদের কত সুখ। মেয়েদের কোনও পাঠশালা নেই, গুরুমশাই নেই, বেতের বাড়ি খাওয়া নেই। তাছাড়া লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের বর মরে। কোন মেয়ে চাইবে তার বর মরুক। রক্ষে করো। মেমটা পড়াশোনা শেখাতে এসে ঠিক করেনি। আজ পাড়ার বয়স্ক পুরুষরা সারা সন্ধে শুধু মেমটাকে নিয়েই কথা বলেছে। পুরুষরা খুব চিন্তা করছে ব্যাপারটা নিয়ে। রাতের অন্ধকারে মেমটা আবার কারুর বাড়িতে চোরের মতো ঢুকবে না তো? পাড়ার ছেলেরা লাঠি নিয়ে আজ পাড়া পাহারা দেবে। ঢুকুক ফিরিঙ্গি মেয়েছেলেটা। পাড়ার ছেলেরা লাঠি আর লম্ফ নিয়ে তৈরি। কিন্তু রাতে মেমটা আসে না সে দিনেই আসে। পাড়ার ছেলেরা তাকে লাঠির বাড়ি মেরে ঠান্ডা করবে সে উপায়ও নেই। মেমসাহেবকে মারলে যদি ব্রিটিশ সরকার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয়। লাল পাগড়ি পুলিশকে যে খুব ভয় করে ছেলেরা। মেমটাকে ছাদ থেকে জুতো দেখানো হয়। জানালা দিয়ে ঝাঁটা দেখানো হয় তবু মেমটা আসে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে হাতজোড় করে। স্বর্ণমণির বিরক্ত লাগে এখন। মেমটার কী খেয়েদেয়ে কোনও কাজ নেই? ও তো মেম, তাই ও জানে না লেখাপড়া করলে এয়োতি মেয়েরা বিধবা হয়, আইবুড়ো মেয়েদের বর জোটে না। এখন মেমটাকে নিয়ে শাশুড়ি জায়েদের সঙ্গে স্বর্ণমণিও ফোড়ন কাটে। পাড়ায় এখন একটাই কথা দিনরাত। কেউ বলে রোগ ছড়াতে আসছে। কেউ বলে ডাইনি, তবে বেশিরভাগ লোকই বলে ভদ্রবাড়ির মেয়েদের নষ্ট করতে আসছে। মেয়েগুলোর মাথা খেয়ে তারপর রাস্তায় নামাবে। আগের দিন রাত থেকে সারা পাড়ার সব কটা বাড়িতে পচা ডিম, মাছের নাড়িভুঁড়ি, নোংরা জল বালতিতে রেখে দিল সকলে। পরের দিন যেই না মেমটা কড়া নেড়েছে ওপর থেকে হড়হড় করে বাড়ির লোক ঢেলে দিল নোংরা জল। মেমটা একটু শিউরে উঠল প্রথমে। মেয়েরা হেসে এ ওর গায়ে সে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু কী আশ্চর্য মেমটা আবার পরের বাড়িতে কড়া নাড়ল। সেখানেও তার মাথায় ঢালা হল জঞ্জাল। মেমটা থামল না। পরের পর বাড়িতে কড়া নাড়তে লাগল। সবার নোংরা জল ফুরিয়ে গেল। মেম পাড়া ছেড়ে গেল না। স্বর্ণমণির বিধবা ননদ গোলাপসুন্দরী হঠাৎ ছুটে নীচে নেমে সদর দরজা খুলে মেমেটাকে বলল, 'আমি ইস্কুলে যেতে চাই। আমাকে নেবে? এ জীবন যে আর আমার আর সহ্য হয় না।' সারা পাড়া সেদিন রাগে দুঃখে অপমানে ফুঁসতে ফুঁসতে চুপ করে রইল। এক বৃদ্ধা দাসী আর লক্ষ্মীরানি ছুটে এসে চুলের মুঠি ধরে বাড়ির ভিতর টেনে আনল গোলাপসুন্দরীকে।

পরদিন স্বর্ণমণির শ্বাশুড়ি আছাড়ি-পিছাড়ি হয়ে কান্না শুরু করলেন। তার শ্বশুর ধর্মনারায়ণ ঠিক করছেন গোলাপসুন্দরীকে কাশীতে রেখে আসবেন। তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের মেয়ের যে বেলেল্লাপনা তিনি দেখেছেন তাতে তাঁকে এই প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

একদিন সকলে ঘুমোচ্ছে গোলাপসুন্দরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ভোর রাতে। সকালে সারা পাড়া যখন গোলাপকে খুঁজছে তখন তাকে নিয়ে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সেই মেম। আজকে তার সঙ্গে আরও দু'জন মেমসাহেব আর একজন শাড়ি পরা বাঙালি মহিলা। সেই মেমটি সেই প্রথম জোরে কথা বলল। সে বলল। আমি নিবেদিতা, যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ আমার আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু। আমি আমার গুরুর নির্দেশে এদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কাজ করছি। আপনারা আমাকে মেরে ফেলুন তবু আমি এখান থেকে যাব না। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার দুই আইরিশ বান্ধবী আর জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের বিদুষী কন্যা সরলাদেবী চৌধুরাণী। গোলাপসুন্দরী কোনও দোষ করেনি। সে শুধু পড়তে চেয়েছে। সে বুঝেছে পড়াশোনা না শেখার অভিশাপ। শুধু গোলাপসুন্দরী নয় এ-পাড়ার আরও দশজন মেয়ে লুকিয়ে আমাকে জানিয়েছে তারা পড়তে চায়। যারা পড়তে চায় তাদের আমি পড়াবোই। দরকার হলে সারাদিন রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব তবু বাড়ির মেয়েদের ইস্কুলে আমি নিয়ে যাবোই।

নিবেদিতাকে কোনওভাবেই সেই পাড়া থেকে সরানো যায়নি। দিনের পর দিন তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। একদিন মাথা ঘোমটায় ঢেকে তাঁর ইস্কুলে গিয়েছে গোলাপসুন্দরী। কারণ পাড়াটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করেছে। স্বর্ণমণির স্বামী গুণেন্দ্রনারায়ণ ভোগী পুরুষ হলেও নির্দয় নয় সে কিছুতেই তার বোন গোলাপকে কাশী যেতে দিতে চায়নি। এদিকে গোলাপও অনড় নিবেদিতার ইস্কুলে সে যাবেই। একদিন গুনেন্দ্র নিজে গোলাপকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। স্বর্ণমণি দেখে গোলাপ রোজ পড়তে বসে। নামতা। প্রথমভাগ। শব্দরূপ। কথামালা। রাইমস। শাশুড়ি কমললতাকে গোলাপ কথামালার গল্প পড়ে বলে দুপুরে। স্বর্ণমণিও শোনে বসে বসে। শাশুড়ি গর্ব করে বলেন। মেয়ের আমার ভারি মাথা। মেয়ে প্রোমোশন পেয়েছে গো, প্রোমোশন। লক্ষ্মীরানি রাগ করে। বাড়ির মেয়েরা এখন গোলাপের কাছে রোজ তার ইস্কুলের গল্প শোনে। শ্বশুর ধর্মনারায়ণ কিছুদিন যাবৎ শয্যাশায়ী। বাড়ির কড়া পরিবেশ এখন অনেকটা শিথিল। স্বর্ণমণি দু'মাসের সন্তানসম্ভবা। সে মাঝে মাঝে গোলাপের বইগুলো উল্টে দ্যাখে। নিজের স্বামীকে সে বলে রেখেছে তার মেয়ে হলে সে কিন্তু মেয়েকে পড়াবে। নিবেদিতা নামে ওই মেমসাহেবের ইস্কুল তো তাদের বাড়ির পাঁচটা বাড়ি পরেই।

উত্তর কলকাতার এই বাড়িতেই শুরু হয় নিবেদিতার প্রথম স্কুল

আমার চোখে কলকাতা

প্রথম পাতার পর

তবে আমার মতো সামান্য কিছু স্বপ্ন সম্বল করে গ্রাম থেকে আসা একজন নিঃস্ব মানুষকে এ-শহর তো ফিরিয়ে দেয়নি। দু'হাত ভরে যা দিয়েছে, তা-ই বা কম কী?

কলকাতা এখন আগের চেয়ে অনেকটাই কল্লোলিনী। আশা রাখি, খুব তাড়াতাড়ি আরও তিলোত্তমা হয়ে উঠবে প্রিয় শহরটা।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

তরুণদের টেক্কা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মজেছে পুরনো প্রজন্ম

সংযুক্তা ঘোষ

কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। নিঃসন্দেহে! সালটা যে ২০১৭। ক্ষমতা শুধুমাত্র চুল বাঁধাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে যে পিছিয়ে পড়তে হবে। নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে সম্বল করে মানুষ সন্ধান করে ফেলল নতুন এক জগতের যার নাম সোশ্যাল মিডিয়া। তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বরিষ্ঠ নাগরিকরাও একটু একটু করে তাদের কুণ্ঠা ও দ্বিধা কাটিয়ে, নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে একে আপন করে নিতে শুরু করেছে এই মাধ্যমে। পৌঁছতে পেরেছেন আলাদা এক দুনিয়ায়। যৌবনকে চ্যালেঞ্জ করে যাঁরা দু-হাত মেলে স্বাগত জানিয়েছেন ইন্টারনেটের জগৎকে। প্রথমদিকে কেবলমাত্র তরুণ প্রজন্ম তাদের একাধিপত্য ফলিয়ে আসলেও, তা এখন আর শুধুই তাদের একার সম্পত্তি রইল না। সীমিত রইল না কোনও বয়সের গণ্ডিতেও। সময়ের চাহিদায় সামাজিক মাধ্যমগুলি ইতিমধ্যেই তার জাল ব্যাপকভাবে বিস্তার করে ফেলেছে পুরনো প্রজন্মের মধ্যেও। নবীনতার এই স্পন্দন এনে দিয়েছে প্রবীণ তথা বার্ধক্য জীবনে।

কয়েক বছর আগেও বাংলার সাহিত্যে বা বাংলা সিনেমা থিয়েটারের আনাচে-কানাচে চোখ রাখলে দেখা যেত বাবা-মাকে কলকাতায় রেখে ছেলে বিদেশ গেছে আর খোঁজ রাখেনি। অথবা বাবার চিঠির উত্তর ই-মেল করে দিলেও বাবা তা খুলেও দেখেনি, বরং উত্তর না পাওয়ার অভিমান জমে জমে বহু সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। সেই দিনের পরিবর্তন ঘটেছে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে সোশ্যাল মিডিয়া তরুণ প্রজন্মের একচেটিয়া ডোমেন। কিন্তু মান্ধাতার আমলের সেই ধারণা এবার নস্যাৎ করে দিয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ডিজিটাল লাইফে পদার্পণ করছেন একালীন প্রাপ্তবয়স্ক সমাজ। অংশগ্রহণ করছেন সামাজিক মাধ্যমগুলিতে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই আবর্তন যখন চোখে পড়ার মতন, ‘ফুর্তির শহর’ কলকাতাও এর অন্যত্র নয়। কখনও প্রয়োজনে, কখনও অবহেলার জবাব দিতে, কখনও-বা শুধুই টাইমপাস বা বিনোদনের জন্যই এর ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠছে তথাকথিত পুরনো প্রজন্ম। তবে পরিসংখ্যান কিন্তু বলছে এ-বিষয়ে তারা বরং নতুন প্রজন্মের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে। বয়োবৃদ্ধ বাঙালিরাও হেনকালে ইন্টারনেটের স্বাদ বেশ টের পেয়ে গিয়েছেন। ২০১৭ সালে দাঁড়িয়ে ছেলের ফ্রেন্ডলিস্টে বাবা বা নাতির সঙ্গে দাদুর অনলাইন চ্যাটিং খুব একটা বিস্ময়কর ঘটনা নয়। চাকরিসূত্রে শহর ছেড়ে বা দেশ ছেড়ে অন্যত্র থাকা ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংযুক্ত

থাকার জন্য ফেসবুক একাই একশো। দেশ হোক বা বিদেশ, বউমার সঙ্গে শাশুড়িমার পটলের দোর্মার রেসিপিটা অনায়াসেই আদান-প্রদান হয়ে যাচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে। নাতি-নাতনিদের দেখতে ইছা করলে টুক করে স্কাইপে খুলে দাদু-ঠাকুমারা দিব্যি সেরে নিচ্ছেন ভিডিও চ্যাটিং। এভাবেই প্রাপ্তবয়স্করা সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যেকার ভৌগোলিক দূরত্বটাও প্রায় অনেকখানি ঘুচে গিয়েছে। বাবা-মা টেক স্যাভি হওয়ায় ছেলে-মেয়েদেরও বেশ সুবিধাই হয়েছে।

যত দিন যাচ্ছে, প্রবীণ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের আনাগোনা আরও বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে। আধুনিক বাজারে স্মার্টফোনেরই চল। পুরনো বোতামটেপা ফোন এখন খুঁজলেও দোকানগুলিতে পাওয়া দায়। কচি-বুড়ো সকলের হাতেই স্মার্টফোন। সার্ভে রিপোর্ট বলছে, ২০১২ সালে ৫০ থেকে ৬৫ বছর বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ এবং ৬৫ অনুর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে নিয়মিত অনলাইনার্সদের মধ্যে ৭১ শতাংশই প্রাপ্তবয়স্ক। সেখানে তরুণদের হার মাত্র ৩৪ শতাংশ। মা-মাসি-পিসি-জেঠি-কাকি এখন সবসময়ই ফেসবুকের সৌজন্যে কানেক্টেড থাকেন। এদের সকলেরই এখন একটা করে অ্যাকাউন্ট আছে ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপে। সেখানে তাদের পরিবার-পরিজনরা আছেন, ছেলে-মেয়েরা আছেন, আর আছেন বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব। প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান চলছে বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও। স্ট্যাটাস লিখছেন, লাইক করছেন, কমেন্ট দিচ্ছেন, আবার পছন্দ হলে শেয়ারও করে ফেলছেন। সোশ্যাল মিডিয়া খুললে আজকাল বরং তাঁদের আনাগোনাই বেশি চোখে পড়ে। তার একটা বড় কারণ হল এই মাধ্যমে অনেকেই ফিরে পেয়েছেন তাঁদের ছেলেবেলার সঙ্গীদের অথবা হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনদের। যাদের সঙ্গে হয়তো বহুদিন যাবৎ কোনও সম্পর্ক নেই, পারিবারিক কোনও ঘটনার জেরে হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগ। এমন কিছু মানুষদের আবার ফিরিয়ে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। ফলে পুনরায় নতুন করে গড়ে উঠছে সম্পর্ক। মা-জেঠিমারা খুঁজে পাচ্ছেন তাঁদের স্কুল-কলেজের বন্ধুদের, যাঁদের সংসারে পা রাখার কারণে একদিন সব মায়া ত্যাগ করে বহু পিছনে ফেলে আসতে হয়েছিল। কারণ সেই সময়ে না ছিল স্যোশাল মিডিয়ার এমন দাপট না ছিল মোবাইল ফোনের চল। ফেসবুক আজ এঁদের কিছুটা হলেও ফিরিয়ে দিয়েছে শৈশব। আর প্রগতির দৌড়ে ডেস্কটপ ও ল্যাপটপকে পিছনে ফেলে এঁদের একত্রিত করে রেখেছে স্মার্টফোন একাই। খুব দামি হোক বা না হোক, ফোনে ইন্টারনেট প্যাকটা ভরিয়ে রাখতে ভোলেন না কেউই। কেউ নিজে ঘেঁটে ঘেঁটে তো কেউ এর-তার কাছ থেকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রপ্ত করে নিচ্ছেন নিয়মকানুনগুলি। তারপর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজেদের কাজের ফাঁকে সময় বার করে নিয়ে দিব্যি হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনও ‘সেলফি’ তুলে সেন্ড করে দিচ্ছেন, তো কখনও ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাচ্ছেন। পুরনো বন্ধু-বান্ধবরা একজোট হয়ে তৈরি করে ফেলেছেন একাধিক গ্রুপ। বাবা-কাকারাও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নন। কোনও প্রয়োজন পড়লেই এখন আর আগের মতন টেলিফোন করতে হয় না। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে টুক করে একটা মেসেজ ছেড়ে দিলেই হয়। বা মন খারাপ লাগলে একটু ইউটিউব থেকে গান শুনে নিচ্ছেন। নাই বা হল টাইপিং স্পিড তাঁদের ছেলে মেয়েদের মতন, প্রতিদিন একটু একটু করে চেষ্টা করলে তা শিখে নিতে কতক্ষণ! ঠিক এভাবেই প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নতুন কিছু শেখার নতুন কিছু জানার। উপভোগ করছেন স্লগ ওভারের একেবারে অন্যরকম এই জীবনকে।

শুধু কি তাই? প্রয়োজনীয় খবরাখবর খুঁজে নেওয়া। ডাক্তারের হদিশ, বেড়াতে যাওয়ার তথ্যতালাশ সবকিছুতেই তাঁরা সন্তানদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

স্যোশাল মিডিয়ার সর্বাধিক সুস্পষ্ট সুবিধা হল, এটি মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ষাট পেরোলে অবসরপ্রাপ্ত একজন মানুষ এখন আর তাই নিঃসঙ্গতায় ভোগেন না। খবরের কাগজ আর টিভির রিমোট নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়াও মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে আরও রোমাঞ্চকর ইনভল্‌ভমেন্ট। চাইলে ২৪ ঘণ্টাই যোগাযোগ করতে পারেন আরেক অবসরপ্রাপ্ত সহকর্মীর সঙ্গে। নিজের মনের অনুভূতিগুলো সেখানে সহজেই ভাগ করে নিতে পারেন। ছেলেমেয়ের কাজের জন্য বয়সকালে যদি স্থানান্তর হতে হয় তাহলে পুরনো পাড়ার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগটাও বিচ্ছিন্ন হয় না। এছাড়াও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আগ্রহী কিছু কিছু গোষ্ঠী। যেমন কেউ যদি তার কম্পিউটার সংলগ্ন কোনও প্রশ্ন সেই গ্রুপে পোস্ট করেন বা কেউ কোনও রান্নার প্রণালি জানতে চেয়ে সেই নির্দিষ্ট গ্রুপে আবেদন করেন, উলটোদিক থেকে নানান মানুষ সেখানে তাঁদের প্রতিক্রিয়া শেয়ার করেন। এভাবেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রবীণরা আদতে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন। কখনও-সখনও সেই মেলামেশা ভার্চুয়াল দুনিয়া ছেড়ে বাস্তবেও রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

পুরনো প্রজন্মকে আজ এই সমস্তভাবে চাঙ্গা করে রেখেছে সামাজিক মাধ্যমগুলি। জীবনের শেষ দফায় এসে নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতাকে জয় করে ওঠার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পোর্টাল। চাকরির পরে প্রবীণ জগতকে নানাভাবে জড়িত ও অনুপ্রাণিত করে রেখেছে ইন্টারনেট। তাঁদের একাকীত্ব দূর করে এনে দিয়েছে উৎসাহ। উদাসীনতা কাটিয়ে নতুন কিছু জানার ও শেখার পথ দেখিয়েছে। দাদু-দিদারা আজকাল চিঠির জায়গায় ই-মেল করে খোঁজ রাখেন নাতি-নাতনিদের। টেলিফোনের বদলে স্কাইপে-তে আদর-আহ্লাদ সেরে ফেলেন। আধুনিক নাতি-নাতনিরাও এতেই অভ্যস্ত। ফলে সীমিত খরচের সরাসরি এই যোগাযোগ সকলের কাছেই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। বরং বয়স্করা এই পথে চালিত হয়ে আরও নবীন হয়ে উঠছেন। বয়স আর বিষণ্ণতা এখন আর সমান্তরাল রেখায় চলে না।

গত এক দশক ধরে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপক বিস্তৃতির মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেই। গবেষণা বলছে এই বৃদ্ধির হার দিনে দিনে আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আশঙ্কার পূর্বাভাষ ইতিমধ্যেই গজিয়ে উঠেছে। তা হল অনলাইনের এই স্মার্ট সম্পর্ক কতদিন মেনে নেবে তরুণ প্রজন্ম? ইন্টারনেট খুলে বাবা-মা-দাদু-দিদাদের সঙ্গে এ হেন মেলামেশা তারা ঠিক কতদিন বজায় রাখবে? প্রাইভেসি বজায় রাখতে হবে তো! আবার অন্যদিকে অল্প জেনে বেশি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক সময় সম্পদ হানির মতো ঘটনাও ঘটছে। তবে সেসব ছেড়ে আপাতত দিব্য এতেই মজে আছে তরুণ-প্রবীণ সমাজ।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

বাবু-কালচার

ঝুমা দাস মল্লিক

সান্ধ্য কলকাতা বড়ই মোহময়ী। চারিদিকে আলোয় আলোময়। কোথাও-বা ত্রিফলা, কোথাও হ্যালোজেন, আবার কোথাও নিয়ন— কত না বাহার। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ছোঁয়া তার অন্তরেও এনে দিয়েছে আলোর স্পর্শ। আজকের কলকাতা আধুনিকও বটে! এই কলকাতাকে দেখে বিশ্বাস করা শক্ত, এখানে এক সময় সন্ধে হলে শেয়াল ডাকত। ছিল ডাকাতের ভয়ও। তাই সন্ধের পর একান্ত প্রয়োজনে মশাল হাতে দলবদ্ধ হয়ে রাস্তায় বেরোত মানুষ। ১৮৫৭ সালে যখন প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলল— সে এক হইহই ব্যাপার। আর সেই আলো সবচেয়ে আলোকিত করল ধনীগৃহের অঙ্গন। ইংরেজদের তৈরি ব্ল্যাকটাউনের সেই ধনীরা ছিল বাবুগিরিতে পটু। সেই বাবুদের বিচিত্র শখ আর খেয়ালের সামান্য কয়েকটি আজকের উপজীব্য।

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ও সমসাময়িক প্রগতিশীলদের স্পর্শ পেয়ে ব্ল্যাকটাউনের একটি শ্রেণি তখন ইংরেজি শিক্ষার উন্মাদনায় আত্মহারা। অথচ সেই সমাজই ধারণ করেছে নবধালক্ষণযুক্ত বাবুদের বিচিত্র শখ ও খেয়ালের গল্প। আজও ইতিহাসের কুঠুরিতে কান পাতলে শোনা যায় সেই গল্প। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো বাবুরা যেমন অমিতব্যয়ী, শৌখিন, বিলাসী ছিলেন; তেমনই সমাজের উন্নতি প্রয়োজনেও এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই।

শহরে এই বাবুরা প্রতি রবিবারে ছেলে-পুলে, ভাগ্নে-জামাই সহ একত্রে বাগানবাড়িতে গিয়ে খ্যামটা শুনত। এদের রক্ষিতা থাকত, যারা 'বাগানি' নামে পরিচিত ছিল বাড়ির মহিলাদের কাছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাবুদের সম্বন্ধে নানা টুকরো তথ্য আমাদের জানিয়ে দেয়। মদ, মাছধরা, সংগীত, নৃত্য, নাটক— বিচিত্র ছিল এদের নেশার সম্ভার। জরিদার পোশাক, গা ভর্তি গয়না, চুলের অ্যালবার্ট ফ্যাশানে সজ্জিত হতে ভালোবাসতেন অধিকাংশ বাবু। নিজেদের পারস্পারিক রেষারেষিকেও এঁরা অনেক সময় শখের কারণ করে তুলতেন। যেমনটা ঘটেছিল উত্তর কলকাতার চূড়ামনি দত্তের। চূড়ামণি দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী নবকৃষ্ণ দেব মারা গেলেন ২২ নভেম্বর, ১৭৯৭ সাল। নিদ্রিত অবস্থায় মারা যাওয়ার পরও প্রতিযোগিতা তাঁকে ছাড়ল না। চূড়ামনির চাই আরও জাঁকজমকের মৃত্যু। তাই গুরুতর পীড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর অপেক্ষায় নয়! রুপোর চতুর্দোলায় চড়ে বহু ঢুলি-বাজনাদার সহ বিয়ে বাড়ির মতো মিছিল করে চূড়ামণি চললেন গঙ্গাযাত্রায়। এই না হলে শখ! অবশ্য রাজা নবকৃষ্ণ দেবও শখ-বিলাসে সবাইকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। পলাশির যুদ্ধের পরপর সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো করার জন্য তিনি নতুন গৃহ নির্মাণ করে ফেলেছিলেন অতি সত্বর। তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের খরচ ছিল কারও মতে নয় লক্ষ আবার কারও মতে বারো লক্ষ টাকা। সে-যুগে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অমিতব্যয় ছিল বাবুদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

যেমন ধরা যাক গোপীমোহন ঠাকুরের কথা। তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে দান করা হয়েছিল ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছিয়ানব্বই রুপোর ষোড়শ এবং এক আটচালা ভর্তি পেতলের বাসন। দেওয়া হয়েছিল একজন গৃহস্থের সারা বছরের খাদ্যদ্রব্য। আনুমানিক খরচ তিন লক্ষ। ভোজসভায় কাঙালি ও অনাহূত ছিল দুই লক্ষ। প্রশ্ন জাগে, সেই কলকাতায় কাঙাল কত ছিল?

গোপীমোহন ঠাকুরের ছিল নানাবিধ শখ। নিজের স্ত্রী মেনকাকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন রুপোর পালঙ্ক। তিনি যখন বেরোতেন বা গদিতে বসতেন তখন সঙ্গী ভৃত্যদের হাতে থাকত লক্ষ টাকার তোড়া। তবে এ কিন্তু কাগজের নোট নয়— কাগজের নোটের ক্ষেত্রে বলা হতো তাড়া। তখন মহাল থেকে আসত রুপোর টাকা ভর্তি কলসি বা থলি— তাকেই বলা হতো তোড়া। ১৮৩৪ সালে কলকাতার টাঁকশালে প্রথম তামার পয়সা, আধ পয়সা ও ডবল পয়সা তৈরি হয়। সেযুগে সিকি ও আধুলিও সাধারণ মানুষের কাছে দামি ছিল, আর ধনীর কাছে লক্ষ টাকাও সামান্য বস্তু।

গদিতে আসীন গোপীমোহনের সামনে থাকত খাঁটি সোনার হুঁকো আর রত্নখচিত সোনার পানদানি। সংগীতরসিক গোপীমোহনের আর এক শখ ছিল কুস্তি খেলা দেখা। তাঁর বেতনভুক কুস্তীগির ছিলেন রাধা গোয়ালা। এই শখের আরেক শৌখিন ছিলেন পাথুরিয়াঘাটারই উমানন্দন বা নন্দলাল মল্লিক। তাঁর বাড়ির সামনে নাকি মেয়েদের মল্লযুদ্ধের আসর বসত। ভৃত্য বৈদ্যনাথ ছিল তাঁর নিজস্ব কুস্তীগির। চন্দ্রকুমার ঠাকুরের আবার ছিল দাবা খেলার শখ। কলকাতায় আধুনিক দাবা টুর্নামেন্টের রূপকার ছিলেন তিনি। ১৮২৯ বা ১৮৩০ সালে সারা ভারতের চল্লিশ-পঞ্চাশজন আমন্ত্রিত দাবাড়ু প্রায় চারমাসব্যাপী দাবা খেলায় অংশ নিয়েছিলেন।

সে-যুগে বাবুরা খবরের কাগজটুকুও পড়ার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। চন্দ্রকুমারের এমন পড়ুয়া ছিলেন পাঁচ-ছয়জন। প্রতিদিন যার সংবাদ নির্বাচন ও পাঠ সেরা হতো, তিনি পেতেন একশো টাকা পুরস্কার। 'কলকাতায় টাকা ওড়ে'— এ-ধরনের কথা সৃষ্টির পিছনে এইসব নজিরও ছিল। চন্দ্রকুমারের ভারতীয়ত্ব ছিল অসামান্য। পথচলতি বিদেশিদের বাড়িতে ধরে এনে ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত করে তাদের ভারতীয় আহার করাতেন। পরিশেষে উপহার-ভূষিত করে গাড়িতে তুলে দিতেন। বিদায় সম্ভাষণ হতো ভারতীয় কায়দায়। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রান্না খাওয়া ছিল আর এক শখ। দক্ষিণের বারান্দায় এক এক দিন পড়ত সারি সারি উনুন। বিভিন্ন প্রান্তের রাধুনিরা পাশাপাশি বসে রাঁধতেন বিভিন্ন পদ। বড়-মানুষের শখ বলে কথা।

সে যুগে বিয়েবাড়ি আর পুজোর বাড়িও ছিল শখ প্রকাশ ও বৈভব দেখানোর জায়গা। নিমাইচরণ মল্লিকের পৌত্রের বিয়েতে বহুমূল্য গোলাপ জল দিয়ে ধোওয়া হয়েছিল রাস্তা। আবার গোপাললাল ঠাকুরের বিয়েতে পাথুরিয়াঘাটায় একটি কৃত্রিম গৃহ নির্মাণ করে সেটা প্রচুর আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। ১৮৩১ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল মহাধুমধাম। ছিল বাইনাচ, ভোজবাজি আর আহারাদির অতি উত্তম ব্যবস্থা।

পুজো ছিল আমোদ-আহ্লাদের আরেকটি ক্ষেত্র। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির দুর্গাপুজোর উৎসব চলত পক্ষকালব্যাপী। পুজো শুরুর থেকেই শুরু হয়ে যেত বাইনাচ। এই নাচ ও খানাপিনা ছিল দেশিবাবু ও ইউরোপীয়দের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। পরবর্তীতে গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ির পুজোরও বিশেষ খ্যাতি ছিল। সেখানে তো একবার ঝালর সুসজ্জিত টানা পাখা ভেঙে পড়ল অভ্যাগত ইউরোপীয়দের ওপর। ভাগ্যে কেউ হতাহত হয়নি। গোপীমোহনের বাড়ির সংকীর্ণ পথে পুজোর সময় ভিড় হয়ে যেত। বিলাসীবাবুরা কিন্তু পথঘাট নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাই সংকীর্ণ, অপরিসর, নোংরা, জঞ্জালপূর্ণ রাস্তার উপর দিয়েই চলত উৎসবের প্রসেশন। নর্দমাগুলোও উপচে পড়ত।

সে-যুগে অন্যান্য পুজোর আড়ম্বরও কিছু কম ছিল না। ১৮২৫ সালে পটলডাঙার বাবু রূপনারায়ণ ঘোষালের বাড়িতে সরস্বতীপুজো উপলক্ষে রাত্রিব্যাপী শখের কবিগান হয়েছিল। ধোবা পাড়ার কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সরস্বতী বিসর্জন উপলক্ষে অশ্লীল সঙ বের করলে পুলিশের কাছে জরিমানা দিতে হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। আবার বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী সরস্বতী বিসর্জন উপলক্ষে চিৎপুরে বারাঙ্গনাদের মধ্যে বিলি করেছিলেন হাজার জোড়া বেনারসি শাড়ি। আর তরুণ দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ টাকায় সরস্বতী পুজো তো মিথে পরিণত। সারা কলকাতার সব মিষ্টি আর গাঁদাফুল জড়ো হয়েছিল ঠাকুবাড়িতে।

দেবেন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে সাজসজ্জাও ছিল একেবারে বাবুয়ানিতে ভরা। শোভাবাজার

রাজবাড়ির নিমন্ত্রণে সব রাজা-রাজরা হীরে-জহরতে নিজেদের মুড়ে এনেছেন। দেবেন্দ্রনাথ এলেন। কোনও অঙ্গে কোনও গহনা নেই— শুধু জুতোয় চমকাচ্ছে মুক্তো। এই না হলে বাবু! ঠাকুরবাড়ির বাবুরা ছিলেন সে যুগের ফ্যাশন দুনিয়ার পথ প্রদর্শক। যেমন উমানন্দন ঠাকুরের পোশাকের অনুকরনেই সে-যুগের উকিলরা শামলা-পাগড়িকে তাদের আদালতের পোশাক করে তোলে। সে-যুগে বাবুদের রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ি, কানে দুল, হাতে বালা, গলায় মালা, জরির পোশাক, জরির জুতো ও কোমরবন্ধের জগঝম্প এবং বহুমূল্য সাজ ছিল বিশেষ বিশেষ দিনের জন্য নির্দিষ্ট। আসলে বাবুরা নিজেকে বড় ভালোবাসতেন— সবাই বাসে। তাই তো সাজগোজ করে শিল্পীদের দিয়ে নিজের আত্মপ্রতিকৃতি রচনা করাতেন। এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জর্জ চিনারিকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন নিজের পোর্ট্রেট।

বাবুদের শখের শেষ ছিল না। বাগান করা, বিজ্ঞানচর্চা, গন্ধবিল ভোজনবিলাস, সংগীত ও নৃত্য আস্বাদন, রক্ষিতা বিলাস— কী নেই সেই তালিকায়। যেমন রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের ছিল পশুশালা নির্মাণের শখ। আর একটা শখ সবারই কমবেশি ছিল— বাগান বাড়ি নির্মাণ ও সাজানো। কিন্তু সে আলোচনার জন্য চাই অন্য পরিসর। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই, পরিসর ছোট।

কলকাতা বদলেছে। আধুনিকতার মোড়কে বদলেছে সভ্যতার সংজ্ঞা। বাবু-কালচার আজ আর নেই। সত্যিই নেই!! তবে যখন দুর্গাপুজোর নামে কোটি কোটি টাকা বাজেটে উড়ে যায়, শোনা যায় অমুকের পুজো, তমুকের পুজো— তার সংজ্ঞা কী? নোংরা পথঘাটের উপরই চলে যায় সজ্জিত প্রসেশন, সঙ্গে আছে উন্মত্ত শব্দের তাণ্ডব। এই উৎসবমুখর বাঙালির সংজ্ঞা কী? মল-কালচার আর অনলাইন শপিংয়ে অভ্যস্ত বাঙালি ব্র্যান্ডেড পোশাকের ট্যাগটা খুলতে কষ্ট পায়। ফ্যাশনদুরস্ত বাঙালি নাইটক্লাব আর পাঁচতারার ব্যাঙ্কোয়েটে মত্ত নিশিযাপনের শেষে বিএমডব্লিউ নামক পক্ষীরাজে চেপে উড়ে যায় সিক্ক-সরণি ধরে। মনে পড়ে যায় হাওয়া বিলাসীবাবুর ল্যান্ডো ধূলিধূসরিত করে দিলেও তাঁর দিকে অপার বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো আপামর বাঙালি। জীবন চলে তার নিজস্ব গতিতে। সাধারণ জীবনের এই গতির খবর কোনও কালেই বাবুদের আয়ত্তে নেই। আগামীর ভবিষ্যৎ রচনা করবে যে ইতিহাস সেখানেই তৈরি হবে আজকের বর্তমান সমাজের স্তরায়ন। সেই সময়ই বলে দেবে, বাবুরা কি শুধু উনিশ শতকেই ছিল, নাকি পরবর্তীতে তারও রূপভেদ ঘটেছে?

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

বিমল রায়

শৈবাল পত্রনবীশ

পর্ব : দশ

নিউ থিয়েটার্স ভারতীয় চলচ্চিত্রকে অনেক রত্ন উপহার দিয়েছে। চিত্রপরিচালক, টেকনিশিয়ান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, চিত্রগ্রাহক সব বিভাগেই ওই স্টুডিওতে সেরা গুণিজনরাই কাজ করতেন। নিউ থিয়েটার্সে থাকতে থাকতেই অনেকেই ভারতবিখ্যাত হয়ে ওঠেন। যেমন ধরা যাক বিমল রায়। ১৯৩০ বা ১৯৪০ সালের শেষদিকে কারিগরি দক্ষতা ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায় ছিলই না। তখন বিনোদন

জগৎকে জীবন দেয় ফোটোগ্রাফি। সে সময় কারিগরি কলাকৌশল এত নিম্নমানের ছিল যে একজন ভালো চিত্রগ্রাহক হওয়া ছিল আকাশকুসুম কল্পনা। সেই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে অনুভূতি বা কল্পনার মধ্যে গভীরতা দরকার ছিল। জীবনের চলমান প্রতিবিম্বকে রূপায়িত করতে গেলে ফোটোগ্রাফিকে জীবন্ত করে তোলা প্রয়োজন। ঠিক সেই কাজটাই করতে পেরেছিলেন বিমল রায়। তাঁর নিরলস প্রয়াস চলচ্চিত্রশিল্পকে উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে ক্যামেরাম্যান বিমল রায় হয়েছিলেন চিত্রনির্মাতা এবং সাফল্যও লাভ করেছিলেন। সে ব্যাপারে এবার সবিস্তারে বলা যাক।

প্রমথেশ বড়ুয়া তখন নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ছবি করবেন। তার আগে অবশ্য নির্বাক যুগে একবার 'দেবদাস' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। বড়ুয়া সাহেবের প্রায় সব ছবিতেই ক্যামেরাম্যান হিসাবে কাজ করেছেন বিমল রায়। সেই সময় ক্যামেরাম্যান হিসাবে তাঁর পরিচিতি সারা ভারত জেনে গেছে। নিউ থিয়েটার্সের রীতি অনুযায়ী 'দেবদাস'-এরও হিন্দি ভার্শন তৈরি হয়। বাংলা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং বড়ুয়া সাহেব। হিন্দিতে অভিনয় করেন কুন্দনলাল সায়গল। তখন বিমল রায় নিউ থিয়েটার্সের অনেক ছবিতেই কাজ করছিলেন। 'দেবদাস'-এ কাজ করে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যানের তকমা পেলেন। স্টুডিওতে টানা দশ বছর চিত্রগ্রাহকের কাজ করার পরে বিমলবাবু একদিন বি এন সরকারকে জানালেন এবারে তিনি চিত্রপরিচালনার কাজ শুরু করতে চান। মি. সরকার এক কথায় রাজি হলেন, কারণ তিনি জানতেন যে বিমল রায়ের প্রতিভা সাধারণ নয়।

'উদয়ের পথে' ছবি পরিচালনার কাজ শুরু হল নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে। চিত্রপরিচালক হিসাবে এটি তাঁর প্রথম ছবি। তিনি প্রথম তারকাপ্রথা অগ্রাহ্য করে ছবির কাস্টিং করলেন। অভিনয় করেছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিনতা রায়, রেখা মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ। অনেকেই জানেন না বিমলবাবুই প্রথম এই ছবির মাধ্যমে ক্যামেরায় কুইক প্যান প্রথার প্রচলন করেন। এই ছবির একটি সংলাপ তখন মুখে মুখে শোনা যেত। ছবির নায়ক রাধামোহন ভট্টাচার্যের লিপে ওই সংলাপটি ছিল, 'সুচের মতো ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে দারিদ্রের মতো দৈত্যের সঙ্গে কী আর লড়াই করা যায়?' আরেকটি দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানটি। চাঁদনি রাতে মায়াবী আলোর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য পরিচালক নিউজাল স্প্রে করে ঘন কুয়াশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। নিউজাল হল একরকমের লাইট অয়েল। বিমল রায়ের সুষমামণ্ডিত লাইটিং ও টেকনিক্যালিটি সেই যুগে ভীষণ রকম প্রশংসা লাভ করে।

আরেকটা কথা বলতেই হবে সংগীত পরিচালক ছবির প্রথমেই টাইটেল কার্ড দেখানোর সময় একটি গানের সুর ব্যবহার করেছিলেন, 'জনগণমন'। ১৯৪৪ সালে তৈরি এই ছবির টাইটেল সং ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরে জাতীয়সংগীতের স্বীকৃতি লাভ করে। ছবির হিন্দি ভার্সন 'হামরাহি' সমান জনপ্রিয় হয়। এরপরের ছবিগুলো হল, 'অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'পহেলা আদমি' (হিন্দি) ইত্যাদি।' তথাপি' নামক একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন বিমল রায়। 'অঞ্জনগড়' ছবির সুপুরুষ নায়ক ছবি মুক্তি পাওয়ার আগেই এক দুর্ঘটনায় মারা যান। ওই ছবিতে সহকারী শব্দযন্ত্রীর কাজ করেছিলেন তপন সিংহ। ছবিতে ব্যবহৃত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও উৎপলা সেনের কণ্ঠে 'সর্বখর্ব তারে দহে' গানটি বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়। ছবিটি বাণিজ্যিকভাবেও সাফল্য লাভ করে। নাজির হুসেনের চিত্রনাট্যে তৈরি 'পহেলা আদমি' তৈরি হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনকে ভিত্তি করে।

নিউ থিয়েটার্সের কাজ সমাপ্ত করে বিমল রায় পাড়ি দেন বোম্বে। প্রথমে ওঠেন মালাডে অশোককুমারের বাড়ি। হিন্দিতে তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি অশোককুমারের বোম্বে টকিজের ব্যানারে শরৎবাবুর 'পরিণীতা'। অশোককুমার, মীনাকুমারী অভিনীত এই ছবিটি বিমল রায় পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

এরিয়ান ইনস্টিটিউশনের ইতিহাস

পান্থজন

নগরজীবন কত বৈচিত্রময়, তা টের পেলাম শহরের এই প্রাচীন জনপদে চলতে গিয়ে। সোনাগাছির চৌহদ্দি ছেড়ে চিৎপুর রোড আর বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থল অতিক্রম করে আমার চলা আবার থেমে গেল এক পুরনো বিদ্যালয়ের সামনে এসে। স্কুলের নাম সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন। ভিতরে ঢুকে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানা গেল এই স্কুলের গোড়াপত্তনের ইতিহাস। শুধু স্কুলের নয় জানতে পারলাম স্কুল সংলগ্ন রাস্তাঘাটের কথাও। বর্তমান স্কুল বিল্ডিং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, একসময় তার একপাশে ছিল বটতলা আর গৌরআঢ্যি স্কুল। এই চিৎপুরেই প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে ভারতের নানা জায়গা থেকে শেঠ-বসাক জাতের তাঁতিরা এসে বসবাস শুরু করে এই অঞ্চলে। প্রভু নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে সেইসব গুজরাটি শেঠেরা জাতে ওঠেন। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করলে (১৭৫৬) ওই সময় চিৎপুরের রাস্তায় বড় বড় গাছ ফেলে পথ আটকে ছিল শেঠ বসাকরা।

এবার আসা যাক বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে। অতীতে একজন মধ্যবিত্ত কিন্তু উচ্চচিত্ত বাঙালি উপলব্ধি করেন যে, একটা অন্যধরনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা একসঙ্গে সহাবস্থান করবে। বিদ্যালয়টির প্রথম সূচনা হয়েছিল (১৮৮৪) শোভাবাজার অঞ্চলের কোনও একটি ভবনে। পুরনো শিক্ষক ও ছাত্ররা কেউই জীবিত না থাকায় শোভাবাজারের ওই ভবনের সঠিক অস্তিত্ব জানা যায় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মশাই তপোবনের পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য জনকোলাহল থেকে দূরে শান্তিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন। কিছুকাল পরে স্কুলটি ওইখান থেকে হরি ঘোষ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এরপর বর্তমান বি কে পাল অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে বসুমতী ভবনে স্কুলটি উঠে আসে। সারদাচরণের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম পরিবর্তন হয়। রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে ডে স্কুল-এ পরিবর্তন ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তরণ তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, হেমন্তকুমার বসু, ফুটবলার গোষ্ঠ পাল এবং ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের। প্রথম থেকেই এই স্কুলটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে কলকাতার শিক্ষা জগতে।

১২৫ বছরের পুরনো স্কুল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলি। আমার চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে হরেকরকম পিতল সামগ্রীর দোকান। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল বহু পুরনো এই সব দোকানে মিলবে পিতলের নানা জিনিস, নানা দামে। ঘড়া থেকে চাঁদমালা, বালতি থেকে পঞ্চপ্রদীপ কী নেই এখানে। কয়েকজন মালিকের সঙ্গে আলাপের পরে জানতে পারলাম চার-পাঁচ পুরুষ আগে তৈরি হয়েছিল এইসব দোকান। আজ এখানে বসেই বাণিজ্যে ব্যস্ত তাঁদের বংশধরেরা। আবার এগোই। চলার পথে পদে পদে বিস্ময়। সামান্য এগোলেই চোখে পড়ে খড়ের কাঠামো, মাটির তাল ইত্যাদি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এসে পড়েছি কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় মৃৎশিল্পের অঞ্চল কুমোরটুলিতে। পুজো আসতে এখনও কয়েকমাস বাকি। তাই এখনই কুমোরটুলির বৃত্তান্ত শোনাতে বসলে বাঙালির হৃদয় হয়তো উদ্বেল হয়ে উঠবে। তাই চিৎপুরের মৃৎশিল্পের কথা তোলা রইল আগামী সংখ্যার জন্য।

ফোটো: লেখক

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

যুক্তি-তর্ক-আড্ডা @ কলকাতা

পরিবেশ নিয়ে কতটা ভাবছি আমরা?

তন্ময় মণ্ডল

সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা ব্যস্ততায়, ভাববার ফুসরত খুবই কম। সময় বদলাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে জীবনধারণের মান। মানুষ আপডেটেড হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে সুখকর জীবনধারনের নতুন নতুন উপকরণ।

প্রতিদিন নিউজপেপার কিংবা টিভি খুললে অন্তত একটা খবর পাওয়া যাবেই, আর সেটা হল সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। কার্বন নিঃসরণ কমানো অথবা ক্লিন জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট প্রতিদিনই চোখে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেক লেখা অনেক আলোচনা হচ্ছে রোজই।

একটি গবেষণা বলছে প্রতি বছর পৃথিবীতে শুধুমাত্র পরিবেশ দূষণের প্রভাবের কারণেই প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা যায়, যার এক তৃতীয়াংশই তৃতীয় বিশ্বের। এটা কি সন্ত্রাসবাদ-যুদ্ধ কিংবা অন্য দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি অমানবিক নয়? প্রতিদিন গড়ে অন্তত ১৯০০ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির দূষণের প্রভাবে মারা যাচ্ছে।

বাতাসে প্রতিনিয়ত কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হল মাত্রাতিরিক্ত কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। দীর্ঘদিন এই দূষণের প্রভাবেই হচ্ছে ফুসফুসের জটিল ক্যানসার, শ্বাসকষ্ট সহ নানবিধ রোগ। কলকাতায় দূষণের মাত্রা দিনকে দিন বাড়ছে। বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণ। কখনও ভেবে দেখেছেন কি কেন দিন দিন আমাদের হাসপাতালগুলোতে ফুসফুস ক্যানসার, পাকস্থলির সমস্যা কিংবা চর্ম রোগীর সংখ্যা বাড়ছে? কেন হার্টের পেশেন্ট দিনকে দিন বাড়ছে? আদতে আমরা কি সারাদিনে একবারও ভাবছি যে পরিবেশে আমরা বাস করছি সেই পরিবেশটা নিয়ে? দূষণ বাড়ছে জানি সবাই কিন্তু নিজে থেকে জেনে-শুনেও কি একটা ভুল কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছি? এই নিয়েই আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

ড: স্বাতী চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ): পরিবেশ দিবস হিসাবে একটা দিনকে বেছে নিয়ে পালন করলেই যে আমাদের প্রোবলেম সলভ হবে তা তো নয়। প্রত্যেকটা দিনই এটা একটা ভাববার বিষয়। আমরা মারাত্মক পরিমাণ টেকনোলজি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি, কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কিন্তু অনেক কম। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে গাড়ির পলিউশন তো দিনকে দিন বাড়ছে। কিন্তু সে সব নিয়ে মাথা ব্যথা খুব একটা নেই। আমরা যে সবজি বাজার থেকে কিনে খাচ্ছি তাতে কী পরিমাণ কেমিক্যালস আছে, কী পরিমাণ কেমিক্যাল আমাদের বডিতে যাচ্ছে এবং এটা আলটিমেটলি লিমিট ক্রস করছে কিনা, সেটার কোনও পরিমাপ আমাদের কাছে নেই, যেটা কিন্তু খুব দরকার। এনভাইরনমেন্ট পলিউশন থেকে রেমিডিয়েট হবার জন্য মনিটারিংটা খুব দরকার। আমার মনে হয় সর্বস্তরে সাধারন মানুষের ভেতর আগামীতে কী দিন আসছে তার আভাস পৌছে দেওয়াটা খুব জরুরি। প্রশাসন অনেক রকম অ্যাকটিভিটি করার চেষ্টা করছে, তবে তা আরও অ্যাকটিভলি হওয়া দরকার। গ্রাম-শহর প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতি মাসেই একটা আওয়ারনেস ক্যাম্প হওয়াটা খুব জরুরি।

হিরণ্ময় মল্লিক (শিক্ষক): মাঝেমাঝেই কলকাতাতে এখন খুব কুয়াশা হয় সকালবেলা। ওটা আসলে কুয়াশা নয় ধোঁয়াশা, স্মোগ। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা বেড়ে গেলেই কিন্তু এটা হয়। এর একমাত্র কারণ এয়ার পলিউশন। কলকাতায় এই যে এত গাড়ি-ঘোড়া চলে এবং এর পাশাপাশি যে নির্মাণকার্য চলছে তা তো কোনও গাইডলাইন মেনে করা হয় না। যার ফলস্বরূপ, আমরা যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই দেখব 'লন্ডন স্মোগ' বলে একটা স্মোগ হয়েছিল এবং এখানে একসাথে ৫০-৬০ হাজার মানুষ মারা গেছিল। কলকাতায় কিন্তু আগামীতে এরকম কিছু হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি আমরা এখন থেকে সচেতন না হই। তারপর এখানে স্পেসের তুলনায় পপুলেশন অনেক বেশি। গ্রাউন্ড লেভেল ওয়াটার পলিউশনও খুব বাড়ছে। প্লাস্টিকের এত ব্যবহার, ফলে গ্রাউন্ড লেভেলে জল নামছে না এবং ভারী ধাতু, কেমিক্যালস জলে মিশছে এটা একটা বড় থ্রেট। আবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং এফেক্টে সি লেভেল বাড়ছে, এই বেড়ে যাওয়ার ফলে লবণাক্ত জল কিন্তু গঙ্গাতে, কলকাতা অবধি চলে আসছে। বিভিন্ন উদ্ভিদ যেগুলোর জন্মানোর কথা লবণাক্ত জায়গায় গঙ্গার পাড়ে অনেক জায়গায় কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে। এটাও একটা অশনি সংকেত। প্রশাসন সিলেবাসের মধ্যে দিয়ে অ্যাওয়ারনেস আনতে চেষ্টা করছে ঠিকই; তবে আমার মনে হয় না এতে খুব একটা ফল হচ্ছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রত্যেকটা সাধারণ মানুষকে ভাবাতে হবে তাদের আগামিদিনের পৃথিবী কী হতে চলেছে। এখন থেকে এটা নিয়ে প্রশাসনের আরও নড়ে চড়ে বসা উচিত। না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

রিমি দত্ত (ছাত্রী): আমার মনে হয় মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে দিনকে দিন। পরিবেশ নিয়ে ভাবার মত সময় খুব কম লোকেরই আছে। আমরা কিন্তু পড়ছি, জানছি, ভাবছি কোন একটা কারণে ইউটিলাইজ করাটা হচ্ছে না। তবে আমাদেরকেই এটা নিয়ে আরও সাবধানী হতে হবে অ্যাটলিস্ট খাবার পর প্লাস্টিকের প্যাকেটটা তো ডাস্টবিনে ফেলাই যায়! আর একটা কথা আমার মনে হয় আমাদের প্রশাসন যদি নগরোন্নয়নের পাশাপাশি এই ব্যাপারগুলোতে একটু নজর দেয়, অনেক বেশি অ্যাওয়ারনেস বাড়বে মানুষের মধ্যে। এই তো রিসেন্টলি বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্সও বলেছেন, নানা কারণে এই পৃথিবী একশো বছরের বেশি আর বাসযোগ্য থাকবে না। এটা খুবই ভয়ংকর একটা বিষয়। এই দুর্বিষহ দিন যাতে না দেখতে হয়, এখন থেকেই যতটা পারা যায় সাবধান হওয়া জরুরি।

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

অনুষ্ঠান @ কলকাতা

রাজার কবিতা স্টুডিও

গত ২৪ মে কলামন্দিরে আশা অডিও-র পক্ষ থেকে এবং ফ্যান্টাসি আনলিমিটেড এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিডেটের সহযোগিতায় আত্মপ্রকাশ ঘটল আর.জে রাজার 'কবিতা স্টুডিও' অ্যালবামটির। ভিন্নস্বাদের এই কবিতার অ্যালবাম নিয়ে বেশ আশাবাদী রাজা। নিছক কবিতা পড়ে এই অ্যালবামের মাধ্যমে রাজা কবিতাপ্রেমী মানুষের মন ছুঁতে চাননি। সুর এবং ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে কবিতাকে যে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। তিনি নিজে কবিতার এক চরিত্র হয়ে উঠতে চেয়েছেন। শম্ভু মিত্র, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, ঊর্মিমালা বসু, জগন্নাথ বসু, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের স্মরণ করেছেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই অ্যালবামে কবিতা পাঠের মাধ্যমে। এই অ্যালবামে সংগীত

পরিচালনা করেছেন সুরকার জয় সরকার, আশু-অভিষেক, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ফোটোগ্রাফি করেছেন অতনু পাল এবং থার্ড আই-এর সদস্যরা।

এদিন 'কবিতা স্টুডিও'-অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে কলামন্দিরে উপস্থিত ছিলেন জয় সরকার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী সেন, অলকানন্দা রায়, কল্যাণ সেন বরাট, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা। প্রত্যেকেই রাজার কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার প্রয়াসকে এককথায় সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ফোটো: সুজয় চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ৫ জুন ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

দেখেছিলাম শান্ত-নিস্তব্ধ ব্যস্ত শহরটাকে

জগলুল ইসলাম বাবুন (লেখক)

কলকাতা মানে আমার কছে খুব প্রিয় একটা আবেগ জড়ানো শহর। কলকাতায় যাওয়াটাও ছিল একটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। আসলে ছোটবেলা থেকেই কলকাতা নিয়ে আমাদের উন্মাদনার শেষ ছিল না। কলকাতার স্টাইল, কলকাতার সংস্কৃতি আরও অনেক কিছুই আমাদের কাছে অনেক প্রিয় ছিল। তাই কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অনেকদিনের।

পেশায় সরকারি চাকুরে হলেও আদতে আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা কিন্তু লেখালিখি। সেই ভালোবাসার সূত্র ধরেই প্রথম কলকাতা আসা। ২০১৪-তে আমি প্রথমবার গিয়েছিলাম কলকাতায়। একটা সাহিত্যের অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাশাপাশি কলকাতার অনেক কাগজেই লিখতে শুরু করেছিলাম প্রায় বছর আটেক আগে। পত্রিকার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আমার প্রথমবার কলকাতায় যাওয়া। বিবেক পাল, পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব বা লেখালিখির ক্ষেত্রে যোগাযোগ ফেসবুকের মাধ্যমে। কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি। কলকাতায় অবশ্য আমার পরিচিত কবি-লেখক অনেকেই আছেন। তাঁদের অনেকের সাথেই গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক, কারও সাথে ভালোবাসার, কারও সাথে শ্রদ্ধার সম্পর্ক। অনেকবার কলকাতা যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি বটে, তবে নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার আগে। তবে শেষমেশ বহুদিনের ইচ্ছে পূরণ হল। যখন কলকাতা শহরে পৌঁছলাম থেকে হোটেলে ফিরে একটু রেস্ট নিয়ে একটা পুলকিত হৃদয়ের সে গভীর অনুভব যা শুধু কলকাতাকে ঘিরে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

বিবেকবাবু শিয়ালদহ স্টেশনেই অপেক্ষায় ছিলেন আমার জন্য। শিয়ালদায় পৌঁছে দেখালাম মানুষের ভিড়ে, সে অন্য কলকাতা। যার হৃদয়ের খাঁজে খাঁজে ব্যস্ততার ছাপ, তবু কোথাও যেন সবাইকে আগলে রাখছে একটা স্নেহময়ী হাত। আমার সাথে কলকাতার প্রথম সাক্ষাৎটাই ঝড়-ঝঞ্ঝাপূর্ণ। সময়টা বৈশাখের শেষ, কলকাতায় পৌছনোর পর যখন শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে হোটেলে পৌঁছলাম, দেখলাম আকাশে মেঘ ছেয়ে গেছে, বিদ্যুতের ঝলকও শুরু হয়েছে। হোটেলের রুমে আমি বিবেকবাবু, কবি সুব্রত নায়েক। প্রচণ্ড ঝড় শহর জুড়ে। হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যে কলকাতাকে দেখেছিলাম সে এক অন্য কলকাতা। এত শান্ত এত নিস্তব্ধ এই ব্যস্ত শহরটা!

পরেরদিন অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনের জীবনানন্দ সভাঘরে। বিকেল পাঁচটায়। তাই সকালে কলকাতার কিছু লেখক বন্ধুকে ফোন দিলাম কফি হাউসে আড্ডা দেবার জন্য। যদিও তারা সবাই জানত আমি ওইদিন কলকাতা আসছি। চার বন্ধুর সাথে আড্ডা দিলাম সকাল থেকে দুপুর অবধি আমার বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নের জায়গা কফি হাউসে। কবিতার আড্ডা চলল সঙ্গে অনেক নতুন বন্ধুদের সাথে আলাপও হল। বইপাড়ার একটা আলাদা গন্ধ আছে। সেই মায়াবী গন্ধের টানে বারবার কলেজ স্ট্রিট-কফি হাউস যেতে মন চায়। যাইহোক তারপর সেখান

ট্যাক্সি ধরে সোজা রবীন্দ্রসদন। ততক্ষণে সেজে উঠেছে অবনীন্দ্র সভাঘর। অনুষ্ঠান খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হল। তারপর আমাদের আড্ডা শুরু হল রবীন্দ্রসদন চত্বরে। ওই জায়গাটার একটা অন্যরকম পরিবেশ আছে। সেই পরিবেশে মিশে গেলে মনে হয় এই জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা যেখানে মানসিক শান্তির সমস্ত রকম খোরাক রয়েছে।

পরদিন বেরোলাম কলকাতা ঘুরতে, হাতে মাত্র একটাই দিন ঘুরে দেখতে হবে সমগ্র কলকাতা। আমার সঙ্গী হল শুভময় নামে একটি ছেলে, ও কবিতা লেখে, আমার সাথে আলাপ অনেকদিনের সেটাও ভার্চুয়াল জগতে, ফেসবুকে। ও আমাকে যাদুঘর দেখাল, সায়েন্স সিটি দেখাল, ভিক্টোরিয়া দেখাল এরপর আমরা গেলাম সন্ধেবেলা কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়ি। ওটা ছিল ওই সফরে আমার কাছে অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। যতটুকু পারা গেল ঘুরে দেখলাম কলকাতা শহরটাকে তবে একদিনে এই বৃহৎ শহরটির কতটুকুই-বা দেখা সম্ভব? অতৃপ্তি নিয়েই হোটেলে ফিরলাম। শুভময়, বিবেকবাবুদের সাথে প্রায় রাত ১১ টা অবধি আড্ডা হল। তবে আরও কত কী দেখার ছিল কত মানুষের সাথে মেশার ছিল এই শহরের।

তারপর ফিরে এসেছি দেশে। তবু সেই অতৃপ্তি মাঝেই মাঝেই কলকাতার স্মৃতি রোমন্থনে নিয়ে যায় আমায়। প্রিয় মানুষগুলোর সাথে আড্ডা, প্রিয় শহরটার একটু মনের মতো করে ঘুরে দেখার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই টানে আবার যাবো প্রিয় শহরে স্মরণীয় কিছু কলকাতার মুহূর্তের সাক্ষী হতে।

ফোটো: সুজিত জানা

ডিম বিক্রেতা থেকে বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

সোমনাথ আদক

ডিম বিক্রেতা থেকে বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। প্রথাবিরোধী দুঃসাহসিক গদ্য, সাহিত্যজগতে তাঁকে দিয়েছে কথাশিল্পীর আসন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য গদ্যশৈলী, প্রচলিত গদ্যরীতিকে ভেঙে জন্ম দিয়েছে এক নতুন গদ্যরীতির, যা অন্য কারও সঙ্গেই মেলে না। তাঁর গল্পে কাহিনি যতটুকু না থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে জীবনের কথা, মানুষের কথা। মানুষকে জানার প্রয়াস থেকেই তাঁর গল্পরচনা। তাই তাঁর রচনায় আধুনিক যুগের জটিল মানসিকতা, ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের কুটিল প্রভাব দেখা যায়। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বিষয়বস্তুও আর দশজন কথাশিল্পীর থেকে ভিন্ন। মধ্যবিত্ত হয়েও মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, নোংরামি, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর সাহিত্যে। তার গদ্যের তীব্র চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে মেকি, অন্তঃসারশূন্য, কূপমণ্ডুক মধ্যবিত্তের চরিত্র। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলের শিল্প-শ্রমিকেরা যেমন তাঁর লেখার উপজীব্য হয়েছে তেমনি পাশাপাশি তাঁর লেখায় উঠে এসেছে দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষত অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। জীবনকে যেমন বহুভাবে, বহুদিক থেকে তিনি

দেখেছেন, তেমন সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্যকেও। তাঁর কথায়, সাহিত্যের যা কিছু দায় সে তো জীবনেরই। হ্যাঁ তিনিই বাংলা সাহিত্যের এক বিতর্কিত নাম— সমরেশ বসু।

বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪। বাবা মোহিনীমোহন বসু ও মা শৈবলিনী বসু। বাবার দেওয়া নাম সুরথনাথ। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে ঢাকার বিক্রমপুরের সুত্রাপুরে। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনার পর চলে আসেন নৈহাটিতে। ভর্তি হন মহেন্দ্র স্কুলে। অষ্টম শ্রেণিতে ফেল করায় স্কুলই ছেড়ে দিলেন। শুরু হল তাঁর জীবনের আর একটা নতুন অধ্যায়। এসময় তিনি মাথায় করে ডিম, সবজি বিক্রি করতেন। এরপর কিছুদিন বস্তিতে থেকে চটকলের কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের ছবি এঁকেও রোজগার করেছেন। পরবর্তীকালে সত্যপ্রসন্ন দাশের সান্নিধ্যে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে ইছাপুর রাইফেল কারখানায় দৈনিক পাঁচসিকে মজুরিতে চাকরি করেন। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তিনি গ্রেপ্তার হন। এসময় জেলে বসেই তিনি লেখেন জীবনের প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'। ১৯৫১-তে জেলজীবন থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু আগের চাকরিটি আর ফিরে পেলেন না। এখান থেকেই আবার একটা বাঁক নিয়ে চলতে শুরু করল তাঁর জীবন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পুরোপুরি ইতি টানলেন, এবং মন দিলেন সাহিত্যচর্চায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় লিখলেন 'আদাব'। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর। 'পরিচয়' পত্রিকার ১৯৪৬-এর শারদীয়া সংখ্যায় 'আদাব' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পাঠকের কাছে পরিচিত হতে থাকলেন সমরেশ বসু। ১৯৫১সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরণ'। ১৯৬৫ সালে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় 'বিবর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে সারা দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। এরপর 'প্রজাপতি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে। এসময় এই উপন্যাসটিকে নিয়ে ব্যাপক অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে এবং আদালত অবধি জল গড়ায়। বাংলা সাহিত্যে এখনও পর্যন্ত একটি উপন্যাসেরই নাম করা যায় যেটা অশ্লীলতার দায়ে নিম্ন আদালত নিষিদ্ধ করে এবং দীর্ঘ ১৭ বছর পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে বইটি। ১৯৫৭ সালে তিনি লিখলেন 'গঙ্গা'। তারপর ১৯৬৮ -তে 'কোথায় পাবো তারে'। 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা', 'যুগ যুগ জীয়ে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'বাঘিনী ', 'শাম্ব ', 'বিটি রোডের ধারে', 'শ্রীমতি কাফে', 'বিপর্যস্ত', 'টানাপোড়েন' ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি তাঁর গদ্যরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ভিন্ন স্বাদের লেখায় সমরেশ ভিন্ন নামের আশ্রয় নিয়েছেন। 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখা তাঁর উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'চলো মন রূপনগরে', 'মুক্তবেণীর উজানে' ইত্যাদি গ্রন্থ, একাধারে উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনি।

১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ৪২ বছরের সাহিত্যজীবনে নামে-বেনামে উপন্যাসের গ্রন্থের সংখ্যা ১০০টি, এবং গল্পের সংখ্যা ২০০টির কাছাকাছি; 'আদাব' দিয়ে শুরু এবং অসমাপ্ত রেখে গেলেন 'দেখি নাই ফিরে'। তাঁর অধিকাংশ গল্পে সংবেদনশীল ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনিতে তাঁর বিচরণ ছিল, যা বড়দেরও আকৃষ্ট করত, শিশুসাহিত্যিক না হয়েও গোগোল সিরিজের শিশু-উপন্যাসগুলোয় তাঁর দক্ষতা স্পষ্ট। বিষয়-আঙ্গিক মানবভাবনা-জীবনচেতনা যেমন এসেছে তাঁর গল্পে, তেমনি কালচেতনা-বিষয়কে সময়ের কাছে নিয়ে স্থাপন করা তাঁর গল্পের অভিনবত্ব। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দিতে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নাসিরউদ্দিন শাহ ও শাবানা আজমি অভিনীত 'পার' চলচ্চিত্রটির নাম করা যায়।

১৯৫৫-তে 'গঙ্গা' উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন এবং কালকূট ছদ্মনামে লেখা 'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালের অকাদেমি পুরস্কার পান।

খ্যাতিমান ভারতীয় বাঙালি লেখক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে যাঁদের লেখা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সমরেশ বসু সেই শীর্ষসারির প্রতিভাবান লেখকদের একজন হয়ে আপামর পাঠকের হৃদয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন চিরকাল।